সংবাদ
047
তারিখ ... 4 ... 3 ... 80

নয়া বিজ্ঞান পাঠক্রম প্রবর্তনে অসুবিধা কোথায়

হোসনে আরা কোম্প

বর্তমানে বিশ্বে উন্নততর চাকচিক্যপূর্ণ বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সামাজিক কল্যাণে লাগিয়ে আপামর জনসাধারণের উন্নতি করাই হচ্ছে আজকের বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ এই উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে সমসাময়িক বিশ্বের সাথে তালে তাল মিলিয়ে চলার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় ও উপভোগ্যরূপে উপস্থাপনা করা প্রয়োজন। এর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন (১) উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন এবং (২) এসব পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর জন্য উপযুক্ত শিক্ষক।

পূর্বে আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার বই ছিলো তত্ত্ব ও তথ্য-সম্বলিত। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে তত্ত্ব ও তথ্যের আকারে 'মেজার গ্লাসে' ঢেলে শিক্ষার্থীদের পান করাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। যেহেতু এর কোন প্রায়োগিক দিক ছিল না, ফলে সমস্যা সমাধানে এসব জ্ঞান ব্যবহার করতে পারতো না। সনাতন পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শেখানো হতো শুধুমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে। শিক্ষকগণ বিজ্ঞানের জ্ঞান বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিতরণ করতো। শিক্ষার্থীরা এসব তত্ত্ব ও তথ্যকে টুকে নিয়ে মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাস করতো এবং পরীক্ষা পাশের পর সে সব তত্ত্ব ও তথ্য সম্পূর্ণ ভুলে যেতো। ফলে বিজ্ঞানকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। এতে বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়েছে। আসলে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা। তাদের স্বচ্ছ ও যুক্তিসঙ্গত চিন্তাধারার বিকাশ সাধন করা। তাদের অনুধাবনে সাহায্য করা যে, জীবন ও বিজ্ঞান কোন আলাদা বস্তু নয়। প্রতিদিনের জীবনধারণের সমস্যা, আর এই সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি বিজ্ঞান-এই উপলব্ধি শিক্ষার্থীদের অনুধাবন করতে সাহায্য করা। আজকের বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটির বিজ্ঞান প্যানেলের সুপারিশক্রমে বিজ্ঞান বইগুলোর নতুন আংগিকে লেখা হয়েছে। এখানে তত্ত্ব ও তথ্য শেখানোর পরিবর্তে হাতেকলমে কাজ করে সমস্যার সমাধান করে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে আহরণ করতে উৎসাহিত করা হয়।

নতুন বইগুলো নিয়ে অনেক রকম সমালোচনা হচ্ছে। অভিভাবক, শিক্ষক নতুন লেখা এই বই-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছেন। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষকসমাজ এই সব বই-এর দর্শন অনুধাবনে ব্যর্থ হচ্ছেন। শুধুমাত্র ডিগ্রীর জন্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য শেখানো হচ্ছে না। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষকদের অনুধাবন করাতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। আমরা বড় বৈজ্ঞানিক সৃষ্টি করতে না পারি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সচেতনতা-সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারবো--যদি আমরা বিজ্ঞানের বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারি। কোন অস্ত্র নয় যতক্ষণ না সে প্রকৃত যোদ্ধার হাতে শোভা পায়। আমাদের বর্তমান পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী যতই যুগোপযোগী হোক না কেন--যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষকসমাজ এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে না পারবেন ততক্ষণ আমরা বর্তমানে সমন্বিত বিজ্ঞান পাঠক্রমের সুফল আমাদের জাতীয় জীবনে উপলব্ধি করতে পারবো না।

বিজ্ঞান শিক্ষাদানে সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সরকার "বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প চালু করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় ৪০০০ স্কুলকে আনা হয়েছে। এসব স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য স্কুল পরিবেষ্টনীগারের উন্নতি সাধন করা হয়েছে এবং উচ্চতরদের শিক্ষাদানের জন্য স্বল্পকালীন কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রচলন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন পাঠ্যপুস্তকের ব্যাখ্যা-ধারণীয় আমাদের শিক্ষকমণ্ডলীকে অনুপ্রাণিত করা, তারা যেনো বিজ্ঞানকে হাতে-কলমে শিখাতে পারেন।

বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকদের সাথে বর্তমান বিজ্ঞান বই-এর প্রয়োগ সম্বন্ধে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সমস্যাবলী অনুধাবন করা যায়। শিক্ষকরা মনে করেন।

ক) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত নতুন পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের প্রধান অন্তরায়। হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীকক্ষের আয়তন ছোট হওয়া প্রয়োজন। বিজ্ঞান শিক্ষকের স্বল্পতা এবং বিজ্ঞান ছাত্রে সংখ্যা বেশী হওয়ার দরুন দেখা যায় প্রতি ১৫৩ জন বিজ্ঞান ছাত্রের জন্য ১ জন বিজ্ঞান শিক্ষক (আমালপুর জেলার ২০টি স্কুল হতে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান হতে)। বিজ্ঞান ক্লাসের আয়তন বড় হওয়ার দরুন শিক্ষকরা হাতে-কলমে কাজ করার পরিবর্তে বক্তৃতা পদ্ধতির সাহায্য নেন।

(খ) স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান ক্লাসের জন্য কোন আলাদা রুটিন নেই। হাতে-কলমে কাজ করার জন্য ৪০ মিনিটের একটি ক্লাস যথেষ্ট নয় বলে শিক্ষকরা মন্তব্য করেন।

(গ) হাতে-কলমে কাজ করে বিজ্ঞান শেখানোর জন্য শিক্ষকদের কিছুটা প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। প্রস্তুতির জন্য যে সময়ের প্রয়োজন স্কুল রুটিনে বিজ্ঞান শিক্ষকদের তা দেয়া সম্ভব হয় না। ফলে তারা এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে চুটে যান এবং হাতে-কলমে কাজ করার পরিবর্তে বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

(ঘ) স্কুলগুলোতে কোন বিজ্ঞান অনুদান নেই। ফলে পরীক্ষাগার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আলাদাভাবে লোক নেই। শিক্ষকদের পক্ষে ক্লাসের চাপ বেশী থাকায় পরীক্ষাগারের যত্ন নেয়া এবং উন্নতি করা সম্ভব হয় না।

ঙ) যেভাবে বই লেখা সেভাবে পরীক্ষা পদ্ধতি ঠিক করা হয়নি। ফলে শ্রেণীকক্ষের শিক্ষা এবং পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মধ্যে রয়ে যাচ্ছে বিরাট ব্যবধান। তাই শিক্ষকরা হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবর্তে বক্তৃতা পদ্ধতিই বেশী পছন্দ করেন।

(চ) প্রবীন শিক্ষকরা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন। ফলে হাতে-কলমে বিজ্ঞান পড়ানোর জন্য যে সুযোগ সুবিধার প্রয়োজন তার প্রতি তারা উদাসীন।

শিক্ষকদের উপরিউক্ত মন্তব্যগুলো ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার বিজ্ঞান শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় তা হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মূল দর্শন অনুধাবনে শিক্ষকদের ব্যর্থতা।

বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সামাজিক কল্যাণে লাগিয়ে আপামর জনসাধারণের উন্নতি। সমাজের মুষ্টিমেয় লোক বিজ্ঞানকে জেনে তার অভিজ্ঞতাকে সমাজের কল্যাণে প্রয়োগ করতে চাইলেও তা ফলপ্রসূ হয় না। এর জন্য চাই সমগ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

যেকোন সমস্যা সমাধানে সর্বপ্রথম প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গির। একই সমস্যা বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে থাকে। যখন জনসাধারণ জীবনের প্রতিটি সমস্যা--বিশেষতঃ গ্রামে। আলানি হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয় গাছ-পালা ও গোবর (শুকিয়ে ঘুঁটে তৈরী করে)। গাছপালা ব্যবহারের ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আবার গোবরকে আলানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে জৈব সারের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে, ফলে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু আমরা যদি আলানি সমস্যার সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োগ করি তবে সমস্যা সাধারনের রূপ যাবে পাল্টে। গোবরকে পচিয়ে বায়োগ্যাসে রূপান্তরিত করে সেই বায়োগ্যাসকে আলানি হিসেবে ব্যবহার করলে শুধুমাত্র যে আলানি সমস্যার সমাধান হয় তাই নয়, বায়োগ্যাস তৈরীর পরে যে অবশিষ্টাংশ থাকে গোবরের সেই অংশ জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাহলে বায়োগ্যাস ব্যবহারের ফলে আলানি হিসেবে বৃক্ষ নিধন বন্ধ হচ্ছে এবং একই সাথে জমিতে দেয়ার জন্য জৈব সারের সরবরাহেরও ঘাটতি হচ্ছে না।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এধরণের হাজারো সমস্যাকে হাজির করা যায় যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে পর্যালোচনা করলে সমাধান লাভজনক হতে বাধ্য। যেকোন সমস্যাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাধান করার যে আগ্রহ তাই-ই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন মানুষ হয় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন, কার্যকরণ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী, বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগ রাখে, জীবনের কোন সমস্যাকেই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিতে রাজি নয়। একটা সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নাগরিক গড়ে ওঠার ফলে সে দেশে জন্ম নেয় 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি'। আজ পাশ্চাত্যে যে সংস্কৃতি তাকে

সংবাদ
তারিখ 08 FEB 1988
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 3 ...

আমরা বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি বলবো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের বিজ্ঞানের ব্যবহার। ঘর থেকে অফিস-আদালত-কার্যক্ষেত্র, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি জীবনের এমন একটা ক্ষেত্র নেই যেখানে বিজ্ঞানের ব্যবহার ছাড়া কল্পনা করা যায়। জীবন ও বিজ্ঞান সেখানে একাকার হয়ে মিশে গেছে। বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির ফলে সাধারণ মানুষও হয়ে ওঠে বস্তুনিষ্ঠ, সে যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করতে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা লাভ করে। আমরা যে সমাজের অংশ এখানে আমরা "আবেগপ্রবণ সংস্কৃতিতে" বিশ্বাসী এবং অত্যন্ত রক্ষণশীল আমাদের 'আবেগ প্রবণ সংস্কৃতি' আমাদের শিশু-কিশোরদের বস্তুনিষ্ঠ ও যুক্তিসম্মতভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে বাধার সৃষ্টি করছে। এর থেকে আমাদের শিক্ষক-সমাজও অব্যাহতি পাননি। বিজ্ঞান পাঠক্রম প্রয়োগের ক্ষেত্রের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে দুঃখ অংশ।

আমাদের গ্রামের শিক্ষকসমাজ বর্তমান সভ্যতায় বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে খুব একটা সচেতন নন। কারণ গ্রামবাংলার প্রযুক্তিতে এখনও খুব একটা বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগেনি। তাই সেখানে এখনও গরুটানা লাঙ্গল, ডোঙ্গা দিয়ে জমিতে পানি দেয়া, মাটির চুলোতে রান্না, বাঁশের ও ছনের ঘর বাঁধা প্রভৃতি প্রাচীন প্রযুক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে যার এতটুকু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন আজ পর্যন্ত হয়নি। আমাদের পাশের দেশ ভারত খড়কে বিশেষ একটি রাসায়নিক পদার্থে ভুগিয়ে তা দ্বারা বাড়ি বানাচ্ছে। এর ফলে খড়ের স্থায়িত্ব পাঁচ বছরের বেশী হয়। এর জন্য প্রাথমিক খরচও খুব বেশী নয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক লাভ বেশী। মাটির চুলা--বৈজ্ঞানিকভাবে এ চুলা গড়তে পারলে জ্বালানি খরচ অনেক কমে যায়। এরূপ হাজার উদাহরণ দেয়া যায় যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অপরিবর্তনীয় গ্রামা প্রযুক্তি সামান্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় হয়ে উঠতে পারে প্রাণবন্ত ও লাভজনক।

কিন্তু বাইরের পৃথিবীর এত পরিবর্তন, এত কোলাহল, এত আয়োজন এ সম্বন্ধে আমাদের গ্রামবাংলার মানুষ, এমনকি শিক্ষকসমাজও খুব একটা সচেতন নন। বিজ্ঞান প্রযুক্তি থেকে ৪০০০ স্কুলকে প্রকল্পের আওতাভুক্ত করে তাদের শিক্ষকদের স্বল্পকালীন কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দিয়ে, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করে এই বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বাড়ানো সম্ভব নয়। আমরা যারা প্রতিদিন বিজ্ঞানের পরিবর্তনগুলো বাস করি তাদের পক্ষে হয়তো বিজ্ঞান ও আজকের জীবনকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিককে অনুধাবন করা তাদের পক্ষে হয়তো ততটা কষ্টকর নয়। কিন্তু গ্রামা স্কুল শিক্ষকদের কি--"বিজ্ঞানের জ্ঞান জীবনের সাথে সম্পৃক্ত"--এ কথা অনুধাবন করা সম্ভব?

এর জন্য প্রয়োজন ধারাবাহিক প্রোগ্রাম যা দেশব্যাপী আপামর জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করবে। এজন্য প্রয়োজন সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি। এর জন্য প্রয়োজন প্রচার মাধ্যমগুলোর আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। ধারাবাহিকভাবে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান প্রচার করতে হবে। এসব অনুষ্ঠান শুধুমাত্র অনুষ্ঠান হলেই চলবে না--তা যেনো সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে এবং উপভোগ করতে পারে।

শুধুমাত্র শহরে নয় গ্রামেও বিজ্ঞান মেলা করে জনসাধারণকে বিজ্ঞানের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন বই লিখবেন যাতে থাকবে জীবনের আরাম-আয়েশের সাথে সম্পৃক্ত ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রয়োগ। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞাপনে সর্বত্রই থাকবে বিজ্ঞানের প্রচার। বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিক বই-পুস্তক অনুবাদের বন্দোবস্ত থাকবে। শুধু বই লিখলেই হবে না, এগুলো শহর ছাড়িয়ে গ্রামেও পৌঁছানোর বন্দোবস্ত করতে হবে এবং লোকে যাতে পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ এককথায় রেডিও, টি ভি, বিজ্ঞান মেলা, বই, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, অনুবাদ, বক্তৃতা, সভা-সমিতি প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে যদি পুরো জাতিকে নাড়া দেয়া যায়--তবেই হয়তো বিজ্ঞানসচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব। বিজ্ঞান-সচেতনতা থেকে জন্ম নেয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টির ফলে 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির' জন্ম লাভ সম্ভব। আমাদের আজকের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত 'বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির উন্মেষ'। যদি আমরা বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির উন্মেষ সাধন করতে পারি--শুধু তখনই সম্ভব হবে শিক্ষক, অভিভাবক, ছাত্র, জনসাধারণের মধ্যে এ বোধ জাগানো যে বিজ্ঞান না জানার ফলে তারা জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অন্যথায় শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষকে বিজ্ঞান শেখার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য।